শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০৭

হোটেলের ভাড়ার সাথে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম হোটেলের নিয়ম কানুন লেখা কাগজটা। ব্রেকফাস্ট খেতে হলে ন'টার ভেতর যেতে হবে ডাইনিং হলে। পোশাকের ব্যাপারে লেখা আছে অবশ্যই জুতো পরে যেতে হবে। আর কিছু লেখা নেই পোশাক সম্পর্কে। অস্ট্রেলিয়ানরা পোশাকের ব্যাপারে মোটেই খুঁতখুঁতে নয়। এখানে কেন যে জুতোর কথা লিখেছে জানিনা। কোন জামাকাপড় ছাড়া শুধুমাত্র পায়ে জুতো গলিয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে হাজির হলে কেমন হয়? আইনতঃ কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু সভ্যতার সব নিয়মতো আর লিখে দিতে হয়না। এখন বাজে সাড়ে আটটা। ন'টার ভেতর ডাইনিং রুমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছুটির দিনে শুধুমাত্র ফ্রি ব্রেকফাস্ট করার জন্য কেউ এত তাড়াতাড়ি উঠবে না ঘুম থেকে। আসলে উইকডেতে এখানে যারা আসে বেশির ভাগই আসে প্রশাসনিক বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। তাদের জন্য রেডি ব্রেকফাস্ট খুব জরুরী। হোটেল রুমটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। কাল রাতে এতসব চোখে পড়েনি। জানালার পর্দা সরিয়ে দিতেই দিনের আলোয় ভরে গেলো সারা ঘর। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্যাপিটল হিল। এখানেই বিভিন্ন দেশের দূতাবাস। বাংলাদেশ হাই কমিশনও সেখানে। অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পার্লামেন্ট হাউজ দেখতে যেতে হবে সেখানে।

সিডনি ফিরে যাবার বাসের টিকেট করা আছে সাড়ে বারোটায়। হাতে কয়েকঘন্টা সময় আছে ঘুরে বেড়ানোর। রেডি হয়ে হোটেলের চাবি জমা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। পা রাখলাম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীতে। চোখের সামনেই উড়ছে অস্ট্রেলিয়ান পতাকা। ক্যাপিটল হিলে পার্লামেন্ট হাউজের ওপর থেকে উড়ছে পতপত করে।

ছোট্ট শহর ক্যানবেরা। মাত্র তিন লাখ মানুষের বাস এখানে। দু হাজার চারশ স্কয়ার কিলোমিটারের ছোট্ট টেরিটরি। এ-সি-টি বা অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটল টেরিটরি। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স স্টেটের মাঝখানে এই টেরিটরিতেই সম্পূর্ণ পরিকল্পিত এই রাজধানী শহর। ক্যানবেরা সিটির চারপাশে একটা কৃত্রিম হ্রদ, নাম লেক বার্লি গ্রিফিন। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রফলের সাথে তুলনা করলে ক্যাপিটল টেরিটরিকে একটা বিন্দুর মতো মনে হবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে মাত্র ৮৮ কিলোমিটার লম্বা আর পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। এশহরের প্রায় সবকিছুই পূর্ব পরিকল্পিত। এখানকার প্রত্যেকটি গাছও নাকি পরিকম্পনা মতো লাগানো। এ-সি-টির শতকরা চল্লিশ ভাগ জায়গা জুড়ে আছে ন্যাশনাল পার্ক। মুরামব্রিজ নদী বয়ে গেছে শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। ক্যাপিটল হিলকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল গড়ে ওঠেছে অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে। এলাকার নামও তাই নানারকম ক্রিসেন্ট। ঝলমলে সূর্যের আলোয় এত সবুজে ভরা ক্যানবেরা দেখে বোঝাই যায় না যে এখানের সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যকেও মানুষের শাসনে বেড়ে উঠতে হয়েছে।

ক্যানবেরার বয়স এখনো একশ বছরও হয়নি। ১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন গঠিত হবার পরে একটা ন্যাশনাল ক্যাপিটল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সমস্যা হলো কোথায় হবে তা নিয়ে। মেলবোর্ন চায় তাদের ওখানেই হোক, আর সিডনি চায় তাদের শহরেই হোক ফেডারেল ক্যাপিটল। শেষ পর্যন্ত ১৯০৮ সালে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো মেলবোর্ন বা সিডনি কোথাও না হয়ে এই দুই শহরের মাঝামাঝি কোন জায়গায় হবে এই রাজধানী শহর। শহরের ডিজাইন করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হলো। প্রতিযোগিতায় জিতলো একজন আমেরিকানের ডিজাইন। আমেরিকান স্থপতি ওয়াল্টার বার্লি গ্রিফিনের ডিজাইন অনুসারেই গড়ে তোলা হয়েছে এই ক্যানবেরা শহর। নতুন শহরের নাম কী হবে তা নিয়েও কিন্তু কম বিতর্ক হয়নি। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কোন নামই ছিলো না এই শহরের। ১৯২৭ সালে নাম ঠিক করা হয় 'ক্যানবেরা'। আদিবাসীদের শব্দ ক্যানবেরা যার অর্থ হলো মিটিং প্লেস বা সম্মীলন ক্ষেত্র। ক্যানবেরার বেশির ভাগ স্থাপনা তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ১৯৪৬ সালে গড়ে উঠেছে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। সে হিসেবে বেশ নতুন বলা চলে এই শহরটাকে।

পার্লামেন্ট হাউজের কাছে এসে অভিভূত হয়ে গেলাম। প্রথমেই চোখ যায় চার পায়ের উপর দাঁড়ানো বিরাট ফ্লাগ স্ট্যান্ডের উপর। জাতীয় পতাকাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেখানো হয় এখানে। তবে এই সম্মান একেক জনের কাছে একেক রকম। জাতীয় পতাকার রঙে এরা অন্তর্বাসও তৈরি করে। অনেক ট্যুরিস্ট এসে গেছে এর মধ্যেই। দর্শকদের জন্য সপ্তাহের সাতদিনই খোলা থাকে এই পার্লামেন্ট হাউজ, সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। গেট দিয়ে ঢুকতেই বেশ কয়েকজন সিকিউরিটি অফিসার দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে ভয় পাবার কথা হলেও তারা কেউই ভয়ানক দর্শন নয়। বেশ হাসি খুশি। সিকিউরিটি অফিসারদের হাসিমুখ দেখলে তাদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে খুব একটা ভালো ধারণা হয়না। কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তারা কেউ খুব একটা বিচলিত বলে মনে হলো না। হাসি মুখেই ওয়েলকাম জানালো আমাকে। সিকিউরিটি ইউনিটে একটা মেটাল ডিটেক্টরের ভেতর দিয়ে যেতে হয় সবাইকে আর সাথের সব জিনিস পত্র চালান করে দিতে হয় স্ক্যানারের ভেতর। খুবই সহজ যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এটাই একমাত্র প্রবেশ পথ সাধারণের জন্য। আর কোথাও কোন চেকিং এর ব্যবস্থা নেই। গাইড আছে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই। কিছু জানতে চাইলে ঝটপট বলে দিচ্ছে। ভেতরের প্রত্যেকটা ঘরেই যাওয়া যায়। বেশ সুন্দর। সাজানো গোছানো।

এই পার্লামেন্ট হাউজের বয়স মাত্র বারো বছর। ১৯৮৮ সালে তৈরি হয়েছে এই ভবন। ইটালিয়ান স্থপতি রোমাল্ডো জিউরগোলা এই ভবনের ডিজাইন করেছেন। বার্লি গ্রিফিন লেকের ঠিক দক্ষিণ পাড়েই এই পার্লামেন্ট হাউজ। সবুজ পাহাড়ের চূড়োয় বসে আছে এক টুকরো ছবির মতো। পার্লামেন্ট হাউজের ভেতরে অসংখ্য পেইন্টিংস। সবগুলিই অস্ট্রেলিয়ান শিল্পীর আঁকা। সিনেট হল, পার্লামেন্ট হল সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। যখন পার্লামেন্ট অধিবেশন চলে তখনো নাকি দর্শক এসে দেখতে পারে। এদেশের এমপিরা সম্ভবত জনগণকে খুব একটা ভয় পাননা। অথবা বলা চলে জনগণকে খুব বেশি আলাদা মনে করেন না। জনগণ যে এদেশে কাউকেই ছেড়ে কথা কয়না। অস্ট্রেলিয়ায় নাগরিকদের জন্য ভোট

দেয়া বাধ্যতামূলক আর এদেশের সরকারের মেয়াদ তিন বছর। পার্লামেন্ট হাউজের তিনতলায় বিরাট একটা আর্ট গ্যালারিও আছে আর আছে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস সম্বলিত ছবির প্রদর্শনী। ইতিহাসকে এরা আড়াল করে না, আর মনে হয় ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার মানসিকতাও আছে এই জাতির।

পার্লামেন্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই যাওয়া যায় বার্লি গ্রিফিন লেকের পাড়ে। এই লেক কাটা হয়েছে ১৯৬৩ সালে। মুলুংগুলু নামে একটা নদী ছিলো আগে এখানে। নদীটি মরে যায় প্রবাহ না থাকায়। তখন নগর কর্তৃপক্ষ এই লেক কাটার ব্যবস্থা করে। শহরের স্থপতি বার্লি গ্রিফিনের নামে নামকরণ হলো এই হ্রদের। এই লেকের চারপাশের বাঁধানো পাড়ে সাইকেল চালানো যায়, স্কেটিং করা যায়। ইচ্ছে করলে হেঁটে পার হওয়া যায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ। হ্রদের স্বচ্ছ পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট নৌকা। ভাড়া করা যায় ঘন্টা হিসেবে। পানিতে ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে হলে একটা নৌকায় চড়ে বসলেই হলো। হ্রদের মাঝখানে একজায়গায় ক্যাপ্টেন কুক মেমোরিয়াল ওয়াটার জেট। এখান থেকে শূণ্যে পানি উঠে যাচ্ছে প্রায় দেড়শো মিটার। সূর্যের আলোয় হীরক কুচির মতো ঝরে পড়ছে এই জেটের পানি।

হাতের সময় দ্রুত শেষ হয়ে গেলো। চলে এলাম বাস টার্মিনালে। সাড়ে বারোটার বাস সাড়ে বারোটাতেই ছাড়লো। এই বাস আসছে মেলবোর্ন থেকে। এখানে যাত্রী নামিয়ে সিডনিগামী যাত্রীদের তুলেছে। আমার সিট একদম পেছনের দিকে। আবার চলেছি সিডনির দিকে। সিডনি শহরকে দেখতে হবে নিজের মতো করে।

চারঘন্টা লাগলো সিডনি পৌঁছাতে। পথে একবারও থামেনি বাস। সিডনি শহরে ঢোকার সময় একটু রোদ ছিলো আকাশে। কিন্তু বাস থামতে না থামতেই বৃষ্টি নেমে এলো। প্রথমে এক দুই ফোঁটা, একটু পরেই অঝোর ধারায়। আকাশ আলকাতরা হয়ে আছে। এই বৃষ্টি কখন থামবে জানিনা। হোটেল খুঁজতে হবে রাতে থাকার জন্য। সেন্ট্রাল স্টেশানের কাছেই একটা ব্যাকপ্যাকার হোস্টেল আছে। কিন্তু কোন সিট খালি নেই। আরো কয়েকটা হোটেলে ফোন করে দেখলাম। ছোট বড় সব হোটেলেই ক্রেডিট কার্ড চায়। আমার কোন ক্রেডিট কার্ড নেই। সুতরাং আমার কোন আইডেনটিটি নেই বড় হোটেলে থাকার জন্য। উঠতে হবে ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেলে। কিংস ক্রস এরিয়া হলো ব্যাকপ্যাকারদের স্বর্গরাজ্য। অনেকগুলো ব্যাকপ্যাক হোস্টেল আছে এখানে। বিছানা থেকে শুরু করে সবকিছু প্যাক করে পিঠে নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্য কম খরচে থাকার ব্যবস্থা থাকে বলেই তা ব্যাকপ্যাকার্স হোস্টেল। বৃষ্টি ধরে এসেছে একটু। কয়েক ফোঁটা যা ঝরছে এখনো, তাকে খুব একটা পাত্তা দিলাম না। রেইনকোটটা গায়ে চড়িয়ে পিঠে আমার ব্যাকপ্যাক নিয়ে হাঁটতে লাগলাম কিং ক্রসের উদ্দেশ্যে। সিডনি সিটি ম্যাপ ফলো করতে কোন অসুবিধাই হচ্ছেনা। আকাশ মেঘলা হলেও আলোর অভাব নেই কোথাও। রাস্তার আনাচে কানাচে আলো। পার্কের মাঝখানে পায়ে চলার পথে আলো। আক্ষরিক অর্থেই আলোয় ভুবন ভরা। কিংক্রস এরিয়ায় এসেই বুঝতে পারলাম কত ব্যস্ত আর মনোহারি এরিয়া এটা। রাস্তায় প্রচন্ড ভীড়। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে আবার। কিন্তু ফুটপাতে শেড দেয়া আছে।

রাস্তার ধারেই একটা ব্যাকপ্যাকার্স চোখে পড়লো। দোতলায় রিসেপশান। ম্যানেজার ইন্ডিয়ান। নাম ভিক্টর। আমি জায়গা পেলাম ওয়ান সি রুমে। ছয়জনের একটা রুমে একটা সিট খালি আছে। চাবি নিয়ে রুমে ঢুকলাম। ছয়জনের জন্য তিনটা দোতলা বিছানা। চট্টগ্রামের স্টেশান রোডে কিছু ঢালাও বিছানার হোটেল আছে। সারি সারি বিছানা পাতা। ঘুমানোর জন্য বিছানা ভাড়া দেয়া হয়। রুম নয়। এখানেও সেরকম। ছয়জনের জন্য একটা বাথরুম। ঘরের ভেতরেই আছে। ফলে রুম থেকে বেরুবার দরকার নেই। টেলিভিশন ফ্রিজ সবকিছু আছে। এত কম ভাড়ায় এর চেয়ে বেশি আশা করা উচিত নয়। তা ছাড়া বেড়ানো যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে হোটেলে বসে তো কেউ সময় কাটাবে না। সামর্থ্য না থাকলে কত ধরণের যুক্তিই দেখানো যায়। আমার বেশ থ্রিলিং লাগছে।

রুমের ভেতর এই বিকেল বেলা চার বিছানায় চারজন ঘুমাচ্ছে। তিনটে দোতলা বিছানার একটার উপরের একটা আর অন্যটার নিচের একটা বিছানা খালি আছে। কিন্তু নিচের খালি বিছানায় একটা জ্যাকেট মেলে দেয়া, আর ওপরেরটায় দুটো বই রাখা। এদুটোর কোন বিছানাটা খালি বুঝতে পারছিনা। বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বালম্বি লাগানো দুটো বিছানার একটার দোতলায় ঘুমাচ্ছে একটা মেয়ে। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এসময় মেয়েটি চোখ খুলে বেশ স্বাভাবিক গলায় বললো, হাই।
- হাই, ডু ইউ নো, হুইচ সিট ইজ ভ্যাকেন্ট হিয়ার?
- দিস ওয়ান। প্লিস টেক দিস ওয়ান। বলেই সে উঠে বসলো বিছানার ওপর। হাত বাড়িয়ে অন্য বিছানার ওপর থেকে বই দুটো টেনে নিলো নিজের বিছানায়। মেয়েটার গলার স্বর অদ্ভুত মিষ্টি।

ছেলে আর মেয়ে একই রুমে থাকাটা এদেশে খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। আমি ধীরে সুস্থে আমার লকার গুছালাম। লকারের লক ছিলো না, ম্যানেজারের কাছ থেকে তালা চেয়ে নিয়ে এলাম। তালার জন্য আলাদা দশ ডলার জমা দিতে হলো। যাবার সময় তালা ফেরত দিলে টাকা ফেরত দেবে। লকারে ব্যাগটা রেখে সিডনি সিটির ম্যাপ নিয়ে উঠে এলাম আমার দোতলা বিছানায়। মেয়েটি দেয়ালের দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছে। এখন আমি যদি অন্য দেয়ালের দিকে মাথা দিয়ে শুই তাহলে তার মাথায় আমার পা লেগে যাবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আপাতত তার মাথার দিকেই আমাকে মাথা দিতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ট্রেনের বাংকে শুয়ে আছি। কয়েক মিনিট পরেই মেয়েটি আলাপ শুরু করলো,
-হাই, আয়াম সেরাহ্।
সেরাহ্ নামটা খুব প্রচলিত একটা নাম এখানে। বোধহয় প্রতি দশবিশজন মেয়ের মধ্যে একজনের নাম সেরাহ্। আমরা যাকে সারা বা সারাহ্ উচ্চারণ করি তাই হয়ে গেছে সেরাহ্। আমি আমার নাম বললাম। সে তা উচ্চারণ করার চেষ্টা করলো। এরা 'দ' উচ্চারণ করতে পারে না। প্রদীপ হয়ে যায় প্রাডিব। জানা গেলো সারাহ্ সিডনির মেয়ে। এখানেই থাকে, পড়ে কোন্ একটা কলেজে। যে ছেলেরা ঘুমাচ্ছে তারা সব তার বন্ধু। ব্রিসবেন থেকে এসেছে তারা। সারাহ্ তাদের সিডনি শহর দেখাচ্ছে। আমি আর দেরি করলাম না। পরে দেখা হবে বলে ছাতা আর রেইন কোট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘরে বসে সময় নষ্ট করার কোন মানে

হয়না।

ক্ষুধা লেগেছে। ম্যাকডোনাল্ডস খাবো কিনা ভাবছি, চোখে পড়লো 'ইন্ডিয়ান কারি পয়েন্ট' ঠিক রাস্তার ওপারেই। ইন্ডিয়ান টেকওয়ে প্লেস যেরকম হয়ে থাকে সেরকম। খুব ছোট একটা দোকান। মাত্র তিনটা টেবিল আর গোটা দশেক চেয়ার পাতা আছে। টেবিলের ওপর ময়লার আস্তরণ। কাউন্টারে তরকারি যেগুলো রাখা আছে সব আমার পরিচিত। ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টে কাজ করতে করতে আমি মোটামুটি বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি এব্যাপারে। ভাত আর একটা তরকারি নিয়ে খেতে বসলাম। প্লেটেও মনে হলো ময়লা লেগে আছে। মেজাজটা খারাপ হতে শুরু করেছে। ভাবছি যাবার সময় এবিষয়ে কথা বলবো। হঠাৎ কাউন্টারের ছেলেটাকে টেলিফোনে বাংলায় কথা বলতে শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কথায় ঢাকাইয়া আঞ্চলিক টান। বাংলাদেশের মানুষ পেয়ে খারাপ হতে যাওয়া মেজাজ আবার ভালো হয়ে গেলো। টেবিলের ময়লাকেও আর অসহ্য মনে হচ্ছেনা। খুব বাজে স্বাদের রোগেন জোশকেও খুব একটা খারাপ লাগছে না আর। পয়সা দেবার সময় আমি জানতে চাইলাম,
- ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি বাংলাদেশী?
-হুঁ!
মনে হলো আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক নয় সে খুব একটা। আমার বাংলা কথা শুনেও তার মুখে হাসি ফুটলো না। আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার নাম বললাম। সে হ্যান্ডশেক করা বা তার নাম বলা কোনটাই করলোনা। তার চোখে মুখে বিরক্তি। আমি জানতে চাইলাম,
- দোকানের মালিক কি ইন্ডিয়ান?
- না। বাংলাদেশী।
- তবে দোকানের নাম ইন্ডিয়ান কেন? বাংলাদেশী দোকান বললে বুঝি চলে না?
আমার কথা শুনে ছেলেটা এত রেগে যাবে বুঝতে পারিনি। বেশ রাগী রাগী কণ্ঠে বললো,
- খাবার গুলা সব যে ইন্ডিয়ান তা চোখে দেখেন না?
ইন্ডিয়ান তরকারি সম্পর্কে সে আমাকে যা বলতে চাচ্ছে তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে সে আদৌ কিছু জানে কিনা। তার কথা বলার ভঙ্গিতে ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই। আমার সংগে বাংলাদেশী মানুষের এরকম বিতৃষ্ণ ব্যবহার এই বিদেশে আশা করিনি। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো, কোন রকমে সামলে নিলাম। কী দরকার! ছেলেটা হয়তো বড় কষ্টে আছে এখানে। হয়তো অবৈধ ভাবে আছে। কাজ করে যা পায় সব যায় উকিলের পেটে। শুনেছি এই সিডনি শহরে অনেক ছেলে অবৈধ ভাবে এক রুমে দশ বারোজন গাদাগাদি করে থাকে। ঘন্টায় দু'তিন ডলার মজুরীতে কাজ করতে হয় তাদের রেষ্টুরেন্টের কিচেনে বা গ্রোসারীর গুদামে। বৈধ ওয়ার্ক পারমিট নেই বলে কম মজুরীর জন্য কোথাও নালিশও করতে পারেনা। দেশেও চলে যেতে পারছেনা। কী দরকার তার সাথে রাগারাগি করার। নিজের দেশের একজন মানুষ পেয়েও ভালোভাবে কথা বলতে না পারাতে একটু কষ্ট লাগছে ঠিকই। কিন্তু তাকে খুব বেশি পাত্তা দেয়ার দরকার নেই।

কিংক্রস এরিয়া ট্যুরিস্ট আর ব্যাকপ্যাকারদের স্বর্গরাজ্য। দিনের আলো কমার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় নাইট লাইফ। বোঝাই যাচ্ছে কিং ক্রস সিডনির রেড লাইট এরিয়া। এখানের নাইট লাইফ মানে বড় বেশি উচ্ছৃঙ্খলতা। পুলিশের গাড়ি ঘন ঘন টহল দিতে শুরু করেছে।

রাস্তায় দুপাশেই অনেকগুলো নাইট ক্লাব। একটু পর পর এডাল্ট শপ। লাইভ এডাল্ট শো চলছে নানা রকম ছোট বড় থিয়েটারে। সংক্ষিপ্ত পোশাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে অনেক মানুষ, শরীর বিক্রি করা এদের পেশা। যথা সম্ভব দ্রুতপায়ে পার হয়ে এলাম এই এলাকা। সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই চোখের সামনে সাগর। একদম সাগর ঘেঁষে চলে গেছে পায়ে চলা পথ।

হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গার নাম দেখলাম উলুমুলু বে। নামটা বেশ সুন্দর। আর একটু সামনে যেতেই রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন। সিডনি শহরের বেশ কয়েকটা পার্কের একটা। সেই ১৮১৬ সালে গোড়াপত্তন হয়েছে এই পার্কের। পার্কের মাঝখানে পিরামিড আকৃতির গ্রিন হাউজে আছে হাজার রকমের ট্রপিক্যাল প্লান্ট। বৃষ্টি না হলে এই পার্কে ওপেন এয়ার সিনেমা দেখানো হয় গ্রীষ্মকালে। পার্কের একপাশ দিয়ে সাইকেল ট্র্যাক আর পায়ে চলা পথ। এই পথ গিয়ে মিশেছে সিডনি অপেরা হাউজে। অপেরা হাউজের চত্বরে এসে চোখ জুড়িয়ে গেলো। আলো ঝলমল সিডনি অপেরা হাউজ যে এত সুন্দর তা না নিজের চোখে না দেখলে মনে হয় খুব একটা বিশ্বাস করতাম না।

সিডনি শুধুমাত্র এই অপেরা হাউজ নিয়েই গর্ব করে বলতে পারে ''আমি অনন্য''। পৃথিবীর সেরা কয়েকটি স্থাপত্যের একটি হলো এই সিডনি অপেরা হাউজ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সাগর থেকে জেগে উঠেছে বিরাট বিরাট ছয়টি সাদা ঝিনুক। এই অপেরা হাউজ সম্পর্কে পড়েছিলাম একটা ম্যাগাজিনে। সিডনি শহরে কনসার্ট আর অপেরা মঞ্চস্থ করার জন্য ভালো কোন অডিটোরিয়াম ছিলো না। ১৯৪৭ সালে স্যার ইউজিন গুজেন্স নিউ সাউথ ওয়েল্স এর কন্জারভেটোরিয়াম অব মিউজিকের ডিরেক্টর হয়ে আসার পর উদ্যোগ নিলেন একটা ভালো কনসার্ট হল তৈরি করার। কিন্তু পরবর্তী সাত বছরেও তিনি তেমন কিছু করতে পারলেন না এব্যাপারে। রাজ্যের মান তো আর থাকে না অবস্থা যখন হলো, তখন ১৯৫৪ সালে নিউ সাউথ ওয়েল্স এর প্রিমিয়ার জোসেফ কেহিল একটা কমিটি করে কনসার্ট হল তৈরির ব্যাপারটা এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হলেন। প্রাথমিক খরচ ধরা হয়েছিলো সত্তর লাখ ডলার। এই টাকা সংগ্রহ করার জন্য নানারকম সাহায্য তহবিল করা হলো। কিন্তু সবমিলিয়ে নয় লাখ ডলারের বেশি সংগ্রহ করা গেলো না। তখন অপেরা হাউজের নামে লটারি ছাড়া হলো। হু হু করে বিক্রি হলো লটারি। অনেক বছর ধরে চললো এই লটারি বিক্রি আর উঠে এলো এক কোটি ডলারেরও বেশি। অপেরা হাউজের বাজেটও বেড়ে গেলো সেভাবে। যেখানে অপেরা হাউজ তৈরি হয়েছে এই জায়গার নাম ছিলো বেনেলং পয়েন্ট। বেনেলং নামে একজন আদিবাসী জন্মেছিলেন এখানে এবং তিনিই ছিলেন প্রথম আদিবাসী যিনি ইংরেজী ভাষাকে নিজের ভাষা করে নিয়েছিলেন। ডিজাইনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা সেরা স্থপতিরা ২৩৩টি ডিজাইন সাবমিট করলেন। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হলো। ডেনমার্কের স্থপতি জোয়ের্ন উৎজোনের ডিজাইন সেরা ডিজাইন মনোনীত হলো। ধারণা করা হয়েছিলো পরবর্তী চার বছরের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে অপেরা হাউজ। কিন্তু তা হয়নি।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে নির্মাণ কাজ শুরু হলো। কিন্তু এতই ধীরে ধীরে কাজ চলতে লাগলো

যে পরবর্তী চৌদ্দ বছরেও কাজ শেষ হলোনা। এর কারণও ছিলো অনেক। নির্মাণ কাজ শুরু করার পরে দেখা গেলো স্থপতি উৎজোন তাঁর ডিজাইন কমপ্লিট করেন নি তখনো। ডিজাইন আর কন্‌স্ট্রাক্‌শন একই সাথে চলতে লাগলো। এদিকে সরকারের মনোভাবও ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। প্রথমে বলা হয়েছিলো সাড়ে তিনহাজার দর্শক বসতে পারে এরকম একটা বড় অপেরা হল হবে আর একটা বারোশ লোক বসার মতো ড্রামা হল হবে। সে হিসেবে প্রাথমিক ডিজাইন করা হয়েছিলো। এখন সরকার হাতে কিছু বেশি টাকা পেয়ে মনে করলো দুটোর জায়গায় চারটা থিয়েটার হল করা যেতে পারে। সে হিসেবে ডিজাইন চেঞ্জ করতে গিয়ে উৎজোনের মাথা খারাপ হবার জোগাড়। সরকার অবশ্য আবারো তার মনোভাব চেঞ্জ করে চারটার জায়গায় পাঁচটা থিয়েটার বানিয়েছে এই অপেরা হাউজে। জোশের বশে প্রথমে যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছিলো, কাজে হাত দিয়ে দেখা গেলো সেভাবে হাউজ তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। পরে ছাদের ডিজাইন বদলে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে আরো চার বছর গবেষণা করতে হয়েছে উৎজোনকে। কাজ কিছুদিন এগোয়, কিছুদিন বন্ধ থাকে। বাজেটে কুলোয় না, নির্মাণ খরচ বেড়েই চলেছে। সব দোষ গিয়ে পড়ছে স্থপতি উৎজোনের ঘাড়ে। কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে উৎজোনের উপর। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে এই অপেরা হাউজ নির্মাণ একটা বিরাট ইস্যুতে পরিণত হলো। সরকারই বদলে গেলো। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলো অপেরা হাউজের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করবে এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ক্ষমতায় এসেই তারা উৎজোনের বেতন বন্ধ করে দিলো, আর নানারকম দোষ ধরতে লাগলো উৎজোনের ডিজাইনের। একজন শিল্পীর পক্ষে এরকম অপমান সহ্য করা সম্ভব নয়। উৎজোন পদত্যাগ করলেন। এটাই চাইছিলো নতুন সরকার। ১৯৬৬ সালে নির্মাণ কাজের হাল ধরলো অস্ট্রেলিয়ান স্থপতিদের একটা টিম। তারাই কাজটা শেষ করলো। ১৯৭৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হলো এই অপেরা হাউজ। অস্ট্রেলিয়ান অপেরা গোষ্ঠীর 'ওয়ার এন্ড পীস' ছিলো প্রথম অপেরা এই সিডনি অপেরা হাউজের। এর একমাস পরে অক্টোবরের ২০ তারিখে অপেরা হাউজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রানী এলিজাবেথ।

অপেরা হাউজের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। সামনেই হারবার ব্রীজ। ব্রীজের রেলিং এ এখনো জ্বলজ্বল করছে 'ইটারনিটি'। দুদিন আগে এখানে লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছিলো, আজ সবকিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা। নীরবতা চারদিকে। অনেক মানুষ অবাক চোখে দেখছে এই অপূর্ব সৃষ্টি। প্রায় এক হাজার ছোট বড় রুম আছে এই অপেরা হাউজে। পাঁচটি অডিটোরিয়াম, বিরাট এক রিসেপশান হল, পাঁচটি রিহার্সাল স্টুডিও, চারটি রেস্টুরেন্ট, ছয়টি থিয়েটার বার, ষাটটি গ্রীন রুম। অপেরা হাউজের এরিয়া হলো মোট সাড়ে পাঁচ একর। সাড়ে চার একর জায়গা জুড়ে এই ভবন সমুদ্রতলের চেয়ে ৬৭ মিটার উঁচুতে মাথা তুলে বসে আছে। কী পরিমাণ লোহা সিমেন্ট লেগেছে এই বিশাল ভবন তৈরিতে তা নিয়ে সাধারণ কেউ খুব একটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু কেউ যদি জানতে চায় তাহলে খুব সহজেই জানা যায় এখানে অফিস থেকে। পুরো অপেরা হাউজের ওজন এক লাখ একষট্টি হাজার টন। ৫৮০টি বিশাল বিশাল কংক্রীট পিলার চলে গেছে সমুদ্রের নীচে ৮২ ফুট গভীরে। তার ওপর বসে আছে এই বিশাল আইকন। এই বিল্‌ডিং এর সব কাচ এসেছে ফ্রান্স থেকে। পরিমাণও কম নয়, ৬৭ হাজার বর্গফুট। বৈদ্যুতিক তার যা ব্যবহার করা হয়েছে তা একটার সাথে অন্যটা যোগ করলে দৈর্ঘ্য

হবে প্রায় চারশো মাইল। একদিনে এখানে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে তা দিয়ে পঁচিশ হাজার লোক বাস করে এরকম একটা শহর আলোকিত করা যাবে।

সিঁড়ি বেয়ে একদম উপরের তলায় উঠে বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। সামনেই সমুদ্র। ঢেউ এসে লাগছে অপেরা হাউজের দেয়ালে। ছোট ছোট ইঞ্জিন চালিত নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকে। অপেরা হাউজের তিনদিকে ঘুরে দেখা যায় নৌকায় বসে। মনে হচ্ছে সিডনি শহর পুরোটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এরকম একটা পরিবেশে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ছোট ছোট দুঃখ কষ্ট যেন দূর হয়ে যায়। যে কোন বিশালত্বের এটাই হয়তো বিশেষত্ব। সিডনির সব মানুষ কি সময় পায় এখানে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকার, কোন কিছু না করে শুধু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার! ইন্ডিয়ান কারি পয়েন্টের ছেলেটা কি কখনো এসেছে এখানে?

আস্তে আস্তে নেমে এলাম। হারবার ব্রিজের 'ইটারনিটি' আমাকে টানছে। বাম দিকের পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ব্রীজের কাছে। যতটা কাছে মনে হয় আসলে ততটা নয়। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ হাঁটতে হলো। ব্রীজের কাছে এসে দেখি উঠতে হবে প্রায় একশো ধাপ উপরে। পায়ের শক্তি নেই তত। কাল আবার আসতে হবে ভেবে জর্জ স্ট্রিটে উঠে এলাম। রাত এখন গভীর। কিন্তু মনে হচ্ছে না এই শহর ঘুমাবে কখনো। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম কিংক্রসে। এখানে এখন আরো ভীড়। ফুটপাতে হাঁটতে গেলে অন্যের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বা অন্যের ধাক্কা খেয়ে হাঁটতে হচ্ছে। উচ্চস্বরে বাজনা বাজছে। চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। নাইট ক্লাবের সামনে সমানে চেঁচাচ্ছে দালালেরা। ড্রিংক্স ফ্রি, মাংস ফ্রি চিৎকার শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। তার ওপর মাতাল দেহজীবীদের উপদ্রব আছে। গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে সঙ্গী লাগবে কিনা। আর সবচেয়ে বেশি আছে ড্রাগ ডিলিং। পুলিশ সব জানে। তারা পয়সা হয়তো খায় না, কিন্তু কঠিন হাতে দমনও করে না। জাস্ট রুটিন টহল দিয়েই খালাস। আর ঘুষ তারা খায়না এটাও বা বলি কীভাবে। একটা বোঝাপড়া না থাকলে এরকম প্রকাশ্যে ড্রাগের ব্যবসা চলে কীভাবে? কোন রকমে গা বাঁচিয়ে চলে এলাম আমার হোস্টেলে।

রুম অন্ধকার। বাতি জ্বালালাম। সারাহ্ ঘুমাচ্ছে। রুমে আর কেউ নেই। আমি জুতো খুলে বাথরুম ঘুরে এসে আমার দোতলা বিছানায় উঠে বসতেই চোখ খুললো সারাহ্।
- হাই!
সারাহ্র চোখ ফোলা ফোলা। অনেকক্ষণ থেকেই কি ঘুমাচ্ছে সে? জিজ্ঞেস করলাম,
- বাইরে যাওনি আর?
- গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি আমি।
- বন্ধুরা কোথায়?
- তারা নাইট ক্লাবে গেছে। সেখানে আমাকে আর দরকার নেই তাদের। তা ছাড়া নাইট ক্লাবে দমবন্ধ হয়ে আসে আমার। তুমি কোথায় কোথায় ঘুরলে?
গল্প করার মুডে আছে সারাহ্। আমারও খারাপ লাগছেনা তার সাথে কথা বলতে। এরকম মিষ্টি গলা আমি অনেকদিন শুনিনি। সারাহ্ তার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছে। আমি আমার

বিছানায়। মুখোমুখি কথা বলছি আমরা। মাঝখানে লোহার বিছানার ছয় ইঞ্চি উচ্চতার রেলিং।

সিডনি শহরের অনেক তথ্য জানে সারাহ্। মনে হচ্ছে কলেজে তার মেজর সাবজেক্ট সিডনির ইতিহাস। কিন্তু না, তার মেজর হলো সাইকোলজি। সিডনি শহর সম্পর্কে অনেক জানা অজানা তথ্য শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।